প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়

বছর পাঁচেক আগে প্রথম যখন 'ভ্রমণ'-এর পরিকল্পনা মাথায় আসে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমি দুবার দুদিক থেকে হিমাচল প্রদেশ যাই। প্রথমে যাই সাধারণের পক্ষে কিছুটা দুর্গম, প্রায়-অচেনা হিমাচলে— সারাহান, সাংলা, কল্পা, কাজা, কেলং ইত্যাদি অবিশ্বাস্য অঞ্চলে। যাত্রা শুরু করেছিলাম সিমলা থেকে। পথে পনের হাজার ফুট উঁচু কুনজুম পাস হয়ে রোটাং পাস দিয়ে মানালিতে পৌঁছে যাত্রা শেষ। এগারো শো কিলোমিটার ধরে, শুধু দৃশ্যের গরিমা দেখেছি বললে কথাটা ঠিক হয় না, গোটা নিসর্গই যেন এক সঞ্জীবনী মন্ত্র, মনে হয় একের পর এক গৌরবের ছবির মধ্যে ঢুকে পড়ছি। এর আগের বছর শুধু সিমলা-কুলু-মানালি ঘুরতেই সুদূর কলকাতা থেকে হিমাচল প্রদেশে এসেছিলাম ভেবে সেবার বেশ অবাক হয়েছিলাম। যাই হোক অচেনা হিমাচল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতা ফিরে কয়েকদিন পরই আবার রওনা হই। এবার চেনাজানা হিমাচল। ডালহৌসি-ধরমশালা-চাম্বা। ধরমশালা থেকে সেবার অবশ্য জম্মুর কাটরা চলে যাই, বৈষ্ণোদেবী তীর্থে।

এর আগে-পরে ভারতের নানা প্রান্তে আরও অনেকের মতোই অনেক বাৎসরিক ভ্রমণ করেছি। কিন্তু পিঠোপিঠি দুবার হিমাচল দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে 'ভ্রমণ'-এর খুঁটিনাটি পরিকল্পনা দানা বাঁধতে থাকে। ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্র সংস্থায় পত্রিকা প্রকাশনার নানা দিক নিরীক্ষা করবার সুযোগ হয়। সেসব দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও মানসিক অবস্থা ও চাহিদা মতো সেখানকার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের চেহারা ও চরিত্র কীভাবে নির্ধারিত হয় সে-বিষয়ে সাধ্যমতো অবহিত হবার চেষ্টা করি।

এই চর্চার ফলে আমার একটা খুব লাভ হয়েছিল, কত বিভিন্ন বিষয়ে পত্রিকা হতে পারে, কোনও পত্রিকার বিষয়সীমা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া সম্ভব সে-বিষয়ে আমার সীমিত ধারণার গণ্ডি ভেঙে গিয়েছিল। যদিও ওসব দেশে যাকে বলে বেড়িয়ে বেড়ানো তার সুযোগ একেবারেই পাইনি, কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। বেড়ানো না হোক, ভ্রমণ তো সম্ভব হল।

'ভ্রমণ'-এর পরিকল্পনায় একটি তুচ্ছ তথ্যও উল্লেখ করব। গত কয়েক বছরে ছোটদের জন্য আমার কয়েকটি সামান্য লেখায় আমার ভ্রমণমনস্কতা খুঁজে পাই, অথবা হয়তো আমার সেই তৃষ্ণার পরিণামেই এইসব পঙ্‌ক্তি তৈরি হচ্ছিল:

যাও না হে কত যাবে যাও না—
পৃথিবীটা দুচোখের পাওনা।

....

পাহাড় বরফ ঝরনা নদী বন
দেখে দেখে ধন্য দুনয়ন

....

আমিও একা পথও একা— এই মনে হয় বেশ!
দেশের সঙ্গে পথেই দেখা, পথে পথেই দেশ।

এই সব কিছুরই যোগফল এই 'ভ্রমণ'। গত সেপ্টেম্বরে 'ভ্রমণ'-এর একটি নমুনা সংখ্যা প্রকাশ করে পাঠকের কাছ থেকে যে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি তাতে আমরা আরও উৎসাহিত। ক্রমশ আমাদের কল্পনা আরও দূরস্পর্শী, পরিকল্পনা আরও বহুমুখী, পত্রিকার চেহারা আরও দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে, এই আমাদের আশা। সেটা করে দেখানোর বিষয়, বলে বোঝানোর কথা নয়। প্রথম সংখ্যায় তারই সামান্য সূচনা।

তবে একটা কথা, বোধহয় কিছুটা গৌরবের সঙ্গে বলা যায়— 'ভ্রমণ' বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ-পত্রিকা। বাঙালীর ভ্রমণপিপাসাই আমাদের এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় কারণ; প্রেরণা বা ভিত্তিভূমিও বলা যায়। আমাদের বিশ্বাস, ভ্রমণ নিছকই ছুটি কাটানো নয়— প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। ভ্রমণ মানুষের একটি সুকুমার প্রবৃত্তি, জীবনেরই অঙ্গ, হয়তো দিনযাপনেরও নতুন মাত্রা।

'ভ্রমণ', ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

প্রীতিভ্রমণ

অল্প কিছুদিন আগে, কিছুদিনের জন্য সশরীরে দেশের আনাচে-কানাচে বেড়ানো আমার বন্ধ ছিল, দিন কাটছিল রোগশয্যায়। একদিকে যেমন ওষুধ, ডাক্তার, চিকিৎসার ব্যস্ত আয়োজন, অন্যদিকে তেমনই আমার অখণ্ড অবসর। ফলে ঘুমে-জাগরণে আর তো কিছু করার নেই, মন চলে যায় নানা দিকে। কখনও দেশের পথে পথে, কখনও আরও দূরের দিকে।

আমার মহাভাগ্য, হাসপাতালে বিশ্ববিশ্রুত মাদার টেরিজার ঘরের দু-তিনটি ঘর পরেই আমার ঘর, একদিন ভোরবেলা আগে থেকে নার্সকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে আমি গেলাম মাদারকে দেখতে। তাঁর ঘরে যিনি তখন পরীক্ষার জন্য রক্ত নিতে এসেছিলেন, সিরিঞ্জ ফোটাতে যাচ্ছেন, তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে মাদার আমার মাথায় হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ আশীর্বাদ করলেন, ভগবানের কাছে আমার দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করলেন। তারপর সিস্টারকে আমার ঘরের নম্বর জিজ্ঞেস করলেন ও তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমাকে যিশুখ্রিস্টের একটি মূর্তি দিলেন। ধাতুর ছোট্ট মূর্তি, ইটালিতে তৈরি।

মাদার টেরিজা, সকলেই জানেন, এমনই একজন মানুষ যিনি দুঃস্থ দুর্গত মুমূর্ষু মানুষের আশ্রয়, সেবা ও স্নেহদাত্রী রূপে সারা পৃথিবীতেই পরিচিত।

তাঁর এই বিশ্বব্যাপী মানবপ্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিনই নতুন এক

ভ্রমণের স্বপ্ন মনে এল।

দেশের এক অঞ্চলের মানুষ আরেক অঞ্চলের মানুষকে সপরিবারে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়? ধরুন দু-পাঁচ-সাত দিনের ছুটিতে আপনার বাড়িতে থেকে আপনার অঞ্চল ও তার আশপাশ বেড়িয়ে গেলেন। বিনিময়ে আপনিও সপরিবারে আতিথ্য নেবেন আপনার অতিথির বাড়িতে। ভালো মতো পারস্পরিক পরিচয় পর্ব সেরে এমন অজানা ভ্রমণ কি একেবারেই অসম্ভব?

'ভ্রমণ', নভেম্বর ১৯৯৬

দূর-অদূর

মাথায় ঘন কাশফুলের ধাপচাষ, মুখে ভুবন ভোলানো হাসি, প্রবীণ পুরস্কৃত প্রথিতযশা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদেরই বাড়িতে একদিন ভ্রমণকেন্দ্রিক আড্ডায় বলেছিলেন, যে লোক টালায় থাকে সে টালিগঞ্জে তার কোনও বন্ধুর বাড়িতে কয়েকটা দিন ঝাড়া হাত-পা কাটিয়ে গেলে সেও কিন্তু খুব চমৎকার একটা ভ্রমণ হয়ে যায়। কলকাতার একেক জায়গার বৈশিষ্ট্য একেক রকম, গন্ধ ভাষা অলি-গলি পরিবেশ এতই আলাদা যে এক জায়গার লোকের কাছ আরেক জায়গায় গিয়ে কদিন থাকা একটা নতুন দেশ দেখার মতোই। দিব্যি মন ভরে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথাটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল এই জন্য যে সেই আড্ডায় উপস্থিত কবির স্ত্রী লেখিকা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আঠেরো বছর বয়সে সাইবেরিয়া থেকে ট্রেনে দীর্ঘ পাড়ি দিয়ে তখনকার পিকিং, এখনকার বেইজিংয়ে পৌঁছেছিলেন। সেদিনের ঘরোয়া আড্ডায় অন্য অতিথি 'আজকাল' পত্রিকার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক প্রতাপকুমার রায় চিন-রাশিয়ায় গিয়েছেন একাধিকবার, পি টি আইয়ের চেয়ারম্যান, কি ভারত সরকারের নিউজপ্রিন্ট পারচেজ কমিটির সদস্য হিসাবে। গোটা বিশ্বভ্রমণেরও তাঁর খুব বেশি আর বাকি নেই, তা সত্ত্বেও সামান্য ফাঁক পেলেই আজও বেরিয়ে পড়েন কৃষ্ণনগর বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর রায়চকে।

সামান্য এই 'ভ্রমণ'-সম্পাদককেও সংবাদপত্র-সম্পাদকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বা বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হিসাবে ইউরোপের নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, এই তো মাস কয়েক আগেও বাসে করে ঘুরে এলাম স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন (স্থানীয় উচ্চারণে লিসবোয়া)।

সেইসব ভ্রমণ ও তার স্মৃতির পাশে বারুইপুর বারাসত ধপধপি ফুলিয়া শান্তিপুর কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ ডায়মন্ডহারবার ক্যানিং গোসাবা ভ্রমণের কথাও ভুলতে পারি না। গোসাবায় বিদ্যাধরী, নাকি দুর্গাদোয়ানি নদীতে ভরা জ্যোৎস্নায় কবি-অধ্যাপক ও দুঃসাহসিক পর্যটক নবনীতা দেবসেন, তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা ও ভ্রাতৃপ্রতিম দীপঙ্করকে আমাদের নৌকোয় তুলে নিয়ে অলৌকিক জলযাত্রা ও যাত্রা শেষে একের পর এক নদীতীরে একহাঁটু কাদায় আছাড় খাওয়া এতদিন পরেও আমার মনে একটি

মধুর ভ্রমণস্মৃতি হয়ে আছে। এমনকী ডায়মন্ডহারবার লাইনে ধামুরায় স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদিগন্ত ধানখেত চিরে চলে যাওয়া খালে তালগাছের ডোঙায় যেন এক অচিন দেশের দিকে পাড়ি দেওয়া— সে কি কোনও দিন ভোলা যায়? শুনেছিলাম ওই খাল নাকি ডায়মন্ডহারবারের নদীর আত্মীয়।

আমার জীবনে প্রথম ভ্রমণ আরও রোমাঞ্চকর। নিউ মার্কেট থেকে রুকস্যাক মনে করে যেটা কিনেছিলাম সেটা, এখন বুঝি, ছোটদের স্কুল ব্যাগ। তাতে একসেট জামা-প্যান্ট নিয়ে ট্রেনে বাসে পৌঁছে যাই ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ হয়ে নামখানায়। নামখানায় নদীর ধারে টাল দিয়ে রাখা কুমড়োর পাহাড়ই আমার প্রথম পর্বতদর্শন। সেটা ছিল আমার কাছে সন্ন্যাস আর অভিযানের জগাখিচুড়ি। তখন আমার ১৩ বছর বয়স। নামখানার পাগলকরা নদীর গন্ধমাখা হাওয়া আজও মনে হয় আমার দেহ মন ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়ার কথায় মনে পড়ল, একদিন, কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিছু ভাবিওনি, হঠাৎ একটা কোনও লোকাল ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম, পথে প্রায় ওপারহীন মাঠ ভেঙে হাওয়ার ঝাপটা এসে এই-বুঝি-দম-বন্ধ-করে-দেয়-ভাব করে আমার শরীর টলিয়ে দিচ্ছিল, একটু পরেই সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেনটা থামতেই আমি সেই মাঠে নেমে পড়ি। এক সময় মাঠেই ঘুমিয়েও পড়ি।

ঘুম ভাঙতে দেখি একটা শিমুল গাছের তলায় শুয়ে আছি, সামান্য দূরে একটা ছাগলছানা ঘাস খাচ্ছে, তার সঙ্গী এক বালিকা অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। এটা হয়তো আমার জীবনের স্মরণীয় ভ্রমণগুলিরই একটি।

তাই মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়তো ঠিকই বলেছেন, ভ্রমণ মানেই দূরযাত্রা নয়। আমার আজকাল খুব মনে হয়, ভ্রমণের আসল কথা মন, আসল কথা মনের নবজন্ম। দূরত্ব নয়, স্নেহ ও শুশ্রূষা দেবার মতো কোনও পরিবেশ, মনকে রাঙিয়ে দেবার মতো, জাগিয়ে দেবার মতো যে কোনও জায়গা মানুষের আন্তরিক গন্তব্য। ঢিমে গতির কয়েক ঘণ্টার সামান্য রেল ভ্রমণের অসামান্য বিবরণ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দুয়ার হতে অদূরে' আমার মতে ভ্রমণের একটি মহাকাব্য।

যত কাছেই হোক, যত দূরেই হোক, প্রাণ চায়, অচেনা পথে অজানা দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। কী বিশাল আর বিচিত্র এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও প্রাণলোক!

'ভ্রমণ', ডিসেম্বর ১৯৯৬

যাওয়া না যাওয়া

গত বছর যাবার কথা ছিল উলানবাতর, সময়াভাবে যেতে পারিনি। যাঁরা তাদের দেশ দেখার নিমন্ত্রণ করেছিলেন— মোঙ্গোলিয়ান পাবলিশার্স ফাউন্ডেশন— তাঁরা গ্রামজীবনের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে ফ্যাক্সে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মোঙ্গোলিয়ার কয়েকটি গ্রামেও আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এমন স্বপ্নাতীত নিমন্ত্রণ— এও ভাগ্যে ছিল, নিছক সময়াভাবে যেতে পারলাম

না— এমন অদৃষ্টও হয়! একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার অক্ষমতা জানিয়ে যেদিন ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলাম সেদিনই ফ্যাক্স পেলাম— আগামী বছর তাহলে আসতেই হবে।

এসব গত বছরের কথা। এবছর ঠিক হল জাপানের কোবে শহরে সম্পাদকের সম্মেলন সেরে মোঙ্গোলিয়ার নিমন্ত্রণকর্ত্রী শ্রীমতী নারানইয়ারগাল নিজেই কোবে থেকে উলানবাতরে নিয়ে যাবেন আমাকে।

সেই কোবেও যাওয়া হল না। কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের ফ্যাক্সের টেলিফোন লাইন দু-তিন সপ্তাহ খারাপ থাকায় সম্মেলনের কয়েকটি জরুরি কাগজপত্র শেষ পর্যন্ত আর এসে পৌঁছয়নি। সম্মেলন শেষ হল ৩ জুন, আমাদের টেলিফোনও চালু হল ৩ জুন। ওইদিনই প্যারিসে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপারস-এর হেড অফিস থেকে ফ্যাক্স পেয়ে জানলাম গত কয়েক সপ্তাহ প্যারিস ও কোবে থেকে সমানে আমাকে ফ্যাক্স করার চেষ্টা করেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এই নিষ্ফল ফ্যাক্স পাবার দু'দিন পরে কোবে থেকে বৃথাই জরুরি ডাকে কাগজপত্র এসে পৌঁছল। কোবে যাওয়া হল না বলে দুঃখ নেই, দুঃখ এই যে মোঙ্গোলিয়ার নিমন্ত্রণ এবারও রাখা হল না।

নিমন্ত্রণ মানে ভালোবাসা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ তার স্বভাবের ভেতর থেকে সদাই একে অন্যকে নিমন্ত্রণ করে, সান্নিধ্যের ক্ষুধায় একে অন্যের সন্ধানে ফেরে। এই তার আনন্দ, এতেই তার মনের ভাব সম্প্রসারণ।

হায়, কত দিন কত রাত কত কল্পনা করেছিলাম, মোঙ্গোলিয়ার গ্রামে গ্রামে খুব অন্যরকম জীবনযাত্রা দেখব! পোশাক, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতি সব দিক থেকেই অন্যরকম, আমার সম্পূর্ণ অচেনা।

১৯৯০-এর গ্রীষ্মে কোপেনহেগেনে বন্ধু পেয়েছিলাম লিথুয়ানিয়ার 'রেসপুবলিকা' কাগজের প্রধান সম্পাদক বিতাস টমকুসকে। এমনই গভীর বন্ধুত্ব যে বিদায়ের দিন কথা দিতে হল, সেবছরই যেতে হবে তার শহর ভিলনিয়াস-এ।

কয়েকদিন পর দেশে ফিরেই চিঠি পেলাম— কবে যাচ্ছি লিথুয়ানিয়ায়? সেও আসতে চায় ভারতে, দু'দেশের মধ্যে এই আমাদের আনাগোনা কি চালানো যায় না?

তখনও অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন, লিথুয়ানিয়া তারই একটি অঙ্গরাজ্য। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধের ডামাডোলে চিঠিপত্র কমতে কমতে বন্ধই হয়ে গেল। শেষ চিঠি লিখেছিলাম আমিই, বিতাসের ও তার দেশের কুশল জানতে চেয়ে, কেননা যুদ্ধের তো আর হৃদয় থাকে না, থাকে শুধু মারণাস্ত্র। সে চিঠির উত্তর না পেয়ে বহুদিন স্তব্ধ হয়ে ছিলাম।

এক সময় যুদ্ধ শেষ হল। লিথুয়ানিয়া হল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ক্রমশ রেসপুবলিকাও হয়ে উঠল দেশের বৃহত্তম দৈনিক সংবাদপত্র। এতদিনেও আমরা যে কেউ কাউকে ভুলিনি সেকথা দু'জনেই টের পেলাম গত বছর আমস্টারডামে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাত্র চারদিনের ব্যস্ত দেখাশোনার মধ্যেই ঠিক হল খুব শিগগিরই আমাকে যেতে হবে স্বাধীন লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াস-এ।

দেশে ফিরে আমি যাবার তারিখ জানিয়ে দিলেই বিতাস সেইমতো অফিসিয়াল নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবে, এয়ারপোর্টে সে নিজে উপস্থিত থাকবে। তাছাড়া আমার জন্য

আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্ট তো ঠিক করা থাকবেই।

শুধু রাজধানী নয়, লিথুয়ানিয়ার গ্রামও দেখতে চাই শুনে বিতাস তার সংস্থার একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানাল গ্রাম দেখবার বড়সড় আয়োজনই তারা করবে।

আর একটা কথাও ঠিক হল। আমি লিথুয়ানিয়ায় গেলে সেখানেই বিতাস তার কলকাতায় আসার তারিখ পাকা করবে।

এর মাসদেড়েক পরে ভিলনিয়াস থেকে অফিসে বিতাসের ফোন এল, কবে আসছো?

আগস্টে চেষ্টা করব শুনে বলল, মাস দেখিয়ো না, দিন বলো।

—এই ধরো আগস্টের মাঝামাঝি।

—আমি শুধু তারিখ শুনতে চাই।

—এই মনে করো, ২০ আগস্ট।

আগস্ট গেল, সেপ্টেম্বর গেল, বছরটাও চলে গেল, আমার আর যাওয়া হল না।

এবছর ঠিক হল, এপ্রিলে যাবই। মাস শেষ হবার আগেই বুঝতে পারলাম, সম্ভব নয়। ফ্যাক্সে সেকথা জেনে খুব দুঃখ জানিয়ে বিতাসও ফ্যাক্স পাঠাল। শেষমেষ কথা হল, কোবেতে তো দেখা হচ্ছেই। সেখানে দিনক্ষণ পাকা হবে। এর আর নড়চড় নেই!

হায়!

'ভ্রমণ', জুলাই ১৯৯৮

আমাজন একদিন আমজনতার বিস্ময় হবে

আমাজনের জঙ্গলে বসে লিখছি। আজ ১৭ জুন। দু'দিন আগে রিও ডি জেনেরো থেকে সকালের বিমানে ব্রাজিলিয়া হয়ে বিকেলে মানাউস (Manaus) পৌঁছেছি। সেখান থেকে কিছুটা বাসে, তারপর সামান্য হেঁটে নিগ্রো নদীতে মোটরবোটে চড়ে আমাজনের জল-জঙ্গলের মধ্যে এখানকার আরণ্যক হোটেল 'আরিয়ায়ু আমাজন টাওয়ার্স'-এ যখন পৌঁছলাম তখন রিও ডি জেনেরোর ঘড়ি অনুযায়ী বিকেল ৫টা, আমাজনের ঘড়িতে বিকেল ৪টে।

পরদিন সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাজনের বৃষ্টিপ্রবণ অরণ্যে, এ যেন আদি-অন্তহীন এক গভীর কুহেলিকা অন্ধকার, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, গাছ-গাছালি লতাগুল্মের জট, অসংখ্য ঝুলন্ত ঝুরি, সিঁড়ির মতো শিকড়, কত রকম ফল ফুল বীজ পাতা, কত রকম কীটপতঙ্গ পাখি প্রাণী— দেখতে দেখতে মনে হয় আদিমকালের অবিকল পৃথিবীর সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়ে গেল। কেউ যদি এভাবে দু-চার ঘণ্টাও আমাজনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, পদে পদে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অসংখ্য বিস্ময় আবিষ্কার করে হয়তো মূক হয়ে যাবেন।

মাঝে মাঝে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে যায়, বহু জায়গায় গাইড ডালপালা কেটে পথ করে দিলে তবেই এগোতে পারছি।

ডালপালা ছাঁটায় আমার অস্বস্তির কথা শুনে গাইড আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, অরণ্যের এতে কোনও ক্ষতি হয় না।

ঘণ্টাদুয়েক গাইডের সঙ্গে ঘোরার পর আমি একটা মস্ত ব্রাজিল-নাট গাছের নীচে বসে গাইডকে ছুটি দিলাম, বললাম ঘণ্টাখানেক পরে আসতে। গাইডের তাতে প্রবল আপত্তি। শেষ পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব, কোনও কারণেই অন্য কোথাও চলে যাব না— এই রকম কড়ার করে আমাজনের অরণ্যে একলা হবার সুযোগ পেলাম।

পর্তুগিজ গাইডের নাম সোলেই। হঠাৎ সামনের গাছ থেকে হরীতকীর মতো একটা ফল ছিঁড়ে নিয়ে হাতের মস্ত দা-এর এক কোপে সেটাকে দু-টুকরো করে ভেতর থেকে ছোট্ট তুলতুলে একটা পোকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমাজনের জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেলে কেউ আর তার চেনা পৃথিবীতে ফিরতে পারে না, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই সবচেয়ে সমস্যা। ওই অবস্থায় এই পোকা খেয়েই আমাজনের জঙ্গলে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করতে হয়।

এর মধ্যে একদিন আকাজাতুবা নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম, গ্রামের মানুষজনের ছবি তুলেছি। গিয়েছি প্রায়াগেরাঞ্জি নামে একটা দ্বীপে। কিন্তু ন'টি দেশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত ষাট লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই মহারণ্যের প্রায় ছত্রিশ লক্ষ বর্গকিলোমিটারই যেখানে ব্রাজিলের মধ্যে পড়েছে, সেখানে দুটো একটা গ্রাম, দুয়েকটা দ্বীপ, দু-দশ ঘণ্টার অরণ্য অভিযানে সাধ মেটে না। তাও আবার নিছক এই কথার পিঠে কথা বসিয়ে আমাজনের কীই বা বলা যায়! সঙ্গে ছবি দিতে পারলে খানিকটা তবু আন্দাজ দেওয়া যেত। কিন্তু এখনও আমাজনে ছবি তুলে সেদিনই আমাজন থেকে সরাসরি 'ভ্রমণ'-এর দপ্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি।

শুধু আমাজনের ছবি তুলেই বিখ্যাত হয়েছেন ইতালীয়-ফরাসি আলোকচিত্রী লিওনাইড প্রিন্সিপি। আমাজন নিয়ে বহু দিন ধরে একটা বই লিখেছেন ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো, তাঁর সেই 'আমাজন ইমোশানস' নামের বইয়ে প্রিন্সিপির অসামান্য সব ফটো আছে। আমার আমাজন অভিযানের উপরিপাওনা এই বেরনারদিনোর সঙ্গে আলাপ হওয়া, তাঁর মুখে তাঁর আমাজন অভিজ্ঞতার কথা শোনা। তাঁর পর্তুগিজ ভাষা মুখে মুখে আমাকে ইংরিজি করে শোনান তাঁর মেয়ে এলিয়েনা, আমার ইংরিজি পর্তুগিজে বুঝিয়ে দেন বেরনারদিনোকে।

এলিয়েনার সঙ্গে কথা হল, প্রিন্সিপির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন, আমার লেখার সঙ্গে তাঁর কয়েকটি ফটো ছাপার ব্যাপারেও কথা বলতে চাই। এলিয়েনা বললেন, প্রিন্সিপি এখন এখানেই আছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পাবেন।

সাত সকালেই খবর পেলাম, প্রিন্সিপি গতকালই আবার জঙ্গলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

বেরনারদিনোর বইটির ছবিগুলো প্রিন্সিপির দশ বছরের পরিশ্রমের ফসল। তার পরেও প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে, আজও আমাজনের ছবি তোলার কাজ তাঁর শেষ হয়নি।

আমাজন শুধু পৃথিবীর অতীত নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎও। মানুষের চিরকালের

পরমায়ু। আমাজন বাঁচলে তবেই পৃথিবী বাঁচবে, সেটাই এই জলজঙ্গলের এক আশ্চর্য সৌন্দর্য। আমাজন একদিন আমজনতার বিস্ময় হয়ে উঠবে।

যাঁরা সুন্দরবনে ইকো-ট্যুরিজমের বড় আয়োজন করার কথা ভাবছেন, তাঁরা কি আমাজনের জল-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন? আমাজন তাঁদের অবশ্যই দেখা দরকার। দেখে যাওয়া দরকার নিগ্রো নদীর ওপর দু'বছর ধরে আমাজনের লোকদের দিয়ে তাদেরই গৃহনির্মাণরীতি অনুযায়ী বৃক্ষচূড়ার উচ্চতায় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি দুশো ঘরের এই আরণ্যক হোটেলটি। এই বিস্ময়কর পর্যটক-আবাসটির স্রষ্টা কে জানেন? 'আমাজন ইমোশানস' বইয়ের লেখক ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো।

এবারের এই আমাজন ভ্রমণে পৃথিবীর নানা দেশের পত্র-পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক পরিচালকরা এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল তিমতি বলডিং, সুইডেনের বোনিয়ের সংবাদপত্রগোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট ব্রাউন, ডব্লু এ এন-এর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কানাডার একটি বড় সংবাদপত্রগোষ্ঠীর কর্ণধার পারকিনসন, ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেখর গুপ্ত, মালয়ালম মনোরমা গোষ্ঠীর ম্যামন ও জ্যাকব ম্যাথু, মাতৃভূমির ম্যানেজিং ডিরেক্টর বীরেন্দ্রকুমার ও এরকম আরও কয়েকজনকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম। নানা দেশের কয়েকজনের সঙ্গে আমাজনের কয়েকটি গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা হয়ে আমার খুবই ভালো লাগল।

ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো তাঁর বইয়ে সমুদ্রতত্ত্ববিদ কুস্তোর একটা কথা সযত্নে উদ্ধৃত করেছেন, তার সারমর্ম হল— পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা একদিন পৃথিবী থেকে মুছে যাবে, ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করে আর যারা প্রকৃতি ধ্বংস করে এই দু'টি দলের মধ্যে। সকলের নজর পড়বে আমাজনে। বৈজ্ঞানিক শিল্পী লেখক সাংবাদিক ছুটে আসবেন বিশ্বপ্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে, এই মহারণ্যে কীভাবে কী হচ্ছে তা দেখাই হবে সবচেয়ে বড় তাড়না। সমুদ্রতত্ত্ববিদ কুস্তোর পরামর্শেই বেরনারদিনো বিশ্বের সবচেয়ে বড় জঙ্গলহোটেল আরিয়াযু আমাজন টাওয়ার্স নির্মাণ করেছেন।

'ভ্রমণ', জুলাই ২০০০

যত মন তত ভ্রমণ

আর সামান্য ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় দেখেছি পৃথিবীর যেমন সীমা নেই, দেশ দেখার যেমন শেষ নেই, মানুষের মনেরও কোনও তল নেই, তার ডানা মেলার আকাশও যেন মহাকাশের মতো অনন্ত।

ভ্রমণে চাওয়া-পাওয়াও অনেক রকম। পথে নেমে কার কিসের অন্বেষণ তা জানে শুধু তারই মন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত উক্তি 'যত মত তত পথ'-এর অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে হয়— যত মন তত ভ্রমণ। ঠাকুরের বাগভঙ্গি চুরি করেই বলি, 'ভ্রমণ কি একরকম গা?'

সত্যিই, ভ্রমণের কত রূপ, কত রীতি, কত স্তর, কত মাত্রা। মাসখানেক আগেই ফিরেছি দক্ষিণ নিউজিল্যান্ড থেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সেই স্বর্গরাজ্য এত দূর থেকেও চোখ বুজলেই দেখতে পাই। কবে একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে হঠাৎই দীঘা যাব বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, অশোক নামে আমার এক বইপ্রেমী বন্ধুও জুটে গেছে, সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল তখনকার তরুণদের পাগল করে দেওয়া কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তাঁর মুখে জুনপুটের নাম শুনে আমরা ট্রেনে সোজা খড়্গপুর, খড়্গপুর থেকে বাসে কাঁথি ও সেখান থেকে রিকশায় জুনপুট চলে গেলাম। জনমানবহীন জুনপুটে যখন পৌঁছলাম তখন বর্ষার সন্ধ্যা। থাকার ব্যবস্থা করে আসিনি শুনে রিকশাওলা পকেট থেকে তার ঘরের চাবি বের করে আমার হাতেদিয়ে আদিগন্ত প্রান্তরের একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দিকে আমার বাড়ি। 'ওই আমার ঘর। আর তিনটে ট্রিপ দিয়েই আমি বাসায় ফিরব। আপনারা এগোন।'

সে এক দীর্ঘ কাহিনী। শেষ পর্যন্ত থেকেছিলাম সমুদ্রের বুকে জেলেদের সঙ্গে, মাছধরার নৌকোয়। সেও এক গভীর ভালোবাসার বৃত্তান্ত। অন্ধকার রাতে, রাত দেড়টা-দুটো নাগাদ, বহু দূরে এক ঝাঁক জোনাকি মাত্র লক্ষ করে কয়েক বার বৃহদাকার মাছের কঙ্কালে ও একবার নর-করোটিতে হোঁচট খেয়ে সমুদ্রতীরে নোঙর করা সেই নৌকোয় পৌঁছেছিলাম। নৌকোগুলো ভোরবেলা যাবে মাঝসমুদ্রে মাছ ধরতে, তারই প্রস্তুতি চলছে। জোনাকিগুলো আসলে সমুদ্রতরঙ্গে দোদুল্যমান এইসব জেলে-নৌকোর আলো।

আজ এতদিন পরেও সেই আলো, সেই আনন্দ এক তিলও ভুলিনি। আমরা ছিলাম সন্তোষ মাঝির নৌকোয়। সে আমাকে জুনপুটে মাঘ মাসে জেলেদের মেলায় আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বলেছিল তখন সে আমাকে দূর সমুদ্রে জনহীন একটা দ্বীপে নিয়ে যাবে, যেখানে অনেক অচেনা পাখির বাসা। সন্তোষ মাঝি আর তার জেলেডিঙিতে শেষ রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপরূপ সমুদ্রযাত্রার কথা আগেও লিখেছি।

১৯৮৫তে বালতাল হয়ে একদিনে অমরনাথ যাওয়া-আসার বিপজ্জনক চড়াই-উতরাইয়ে আমাকে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ার পাঠ শিখিয়েছিল একটি কাশ্মীরি বালক, আনাড়ি ছাত্রটির প্রতি তার সেই সযত্ন শিক্ষকতার ভাষা ও ভঙ্গি ছোটদের একটি গল্পে আমি টুকে রেখেছি।

একবার বুখারার বাজারে একটা 'চায়খানা'য় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে চা খেয়েছিলাম, বুখারার আশ্চর্য মসজিদ-স্থাপত্য ও আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে সকালের সেই মুক্তহৃদয় বাজারটি একদানা মুক্তোর মতো আমি কুড়িয়ে নিয়েছি। অনেক জায়গা জোড়া বিরাট এই বাজারেই বুখারার কিশোরী কন্যার দল আমাকে তাদের প্রিয় বলিউড নায়ক ভ্রমে ঘিরে ধরেছিল মনে পড়লে এখনও মজাই লাগে।

তুর্কি সীমান্ত ছোঁয়া জর্জিয়ার আখালসিখের বাজারে পরমাত্মীয়ের মতো গাঢ় মধু, পনির ও আরও কী কী খাইয়ে ছেড়েছিল বাজারের দোকানদাররা, সে ভালোবাসাও কি ভোলবার!

এরকম কত যে ভ্রমণস্মৃতি সঞ্চয় করে চলেছি।

কত রকম ভ্রমণ! ভ্রমণের স্বাদও নানারকম। গন্তব্যের শেষ নেই, বৈচিত্রের শেষ নেই, পথেরও না আছে সংখ্যা, না আছে সীমা। যত মন তত পথ। যে যার নিজের ধরনে পথে নামাটাই আসল। মানুষের মনই তো ভ্রমণ করে। যত মন তত ভ্রমণ।

'ভ্রমণ', ডিসেম্বর ২০০১

নদীপথে, রেলপথে

ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া দানিয়ুব নদী বেয়ে বুদাপেস্ট থেকে ভিয়েনা যাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। আরও ছোটবেলায় বছরে বারকতক দাদুর সঙ্গে গঙ্গা বেয়ে শ্রীরামপুরের চাতরাবাজারঘাট থেকে ভোররাতে বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থঘাটে যাওয়ার স্মৃতি আমার মনে এমনই গেঁথে আছে যে বড় বয়সে পৃথিবীর নানা দেশে যেখানে যে নদীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই নদীবক্ষে পারতপক্ষে আমি না ভেসে পারিনি। হরিদ্বারে হর-কি-পৌড়ির ঘাটে ভক্তজন যখন গঙ্গায় পূর্ণকুম্ভের ডুব দিতে ব্যস্ত, আমি তখন কনকনে শীতল স্রোতে বেশ কিছুদূর সাঁতরে গেছি ভেবে আজও আমার রোমাঞ্চ হয়। গঙ্গা, আমাজন, নীল, ভোল্গা, নেভা ছাড়াও জর্জিয়ার কুরা, চিনের লি, মিয়ানমারের ইরাবতী— এরকম নানা দেশের নানা নদীর বুকে হয় নৌকোয়, নয়তো স্টিমার বা জাহাজে ঘুরেছি। দানিয়ুবেও একদিন অল্প সময়ের সান্ধ্যবিহার হলেও ওই নদী বেয়ে দু-দেশের রাজধানী স্পর্শ করা হয়ে ওঠেনি।

এবছর কার্যগতিকে বুদাপেস্ট ছুঁয়ে সপ্তাহভর হাঙ্গেরি পরিক্রমার শেষে ভিয়েনা যাবার কথা। অতএব এই সুযোগ।

হাঙ্গেরির দক্ষিণপ্রান্ত থেকে সূর্যোদয়ের আগে রওনা হয়ে যখন বুদাপেস্ট পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন বেলা প্রায় বারোটা। সেদিনের ভিয়েনা যাবার জলযান ছেড়ে গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানলাম রোজ সকাল ন'টায় ওই জলযান বুদাপেস্ট থেকে ভিয়েনা রওনা হয়ে যায়। তার একঘণ্টা আগে জাহাজঘাটায় গিয়ে টিকিট কেটে জাহাজে ওঠাই নিয়ম। সকাল ন'টায় রওনা হয়ে ভিয়েনা পৌঁছয় বেলা তিনটে নাগাদ।

দানিয়ুব ধরে যেতে হলে অকারণ একটা দিন বুদাপেস্টে থাকতে হয়। অতএব এবারও মনের ইচ্ছে মনেই রয়ে গেল। ট্রেনের টিকিট কেটে দুপুর ১টা ১০ মিনিটের ট্রেনে উঠে বসলাম। যাব ভিয়েনা।

অতি চমৎকার ট্রেন। ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়য়। প্রয়োজনমতো গতিবেগের কম-বেশি হচ্ছে, মনে হয় যেন আপনাআপনি নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। কামরার স্ক্রিনে গতির কমা-বাড়া দেখা যাচ্ছে।

বুদাপেস্ট থেকে ভিয়েনার মধ্যে এই ট্রেন তিন বা চার জায়গায় থামে। দ্বিতীয় বিরতি হাঙ্গেরি-অস্ট্রিয়ার সীমান্ত শহরে।

কেউ কোথাও আমার পাসপোর্ট দেখা তো দূরের কথা, নম্বরটুকু পর্যন্ত জানতে চাইল না। না টিকিট কাটার সময়, না সীমান্ত পেরোবার সময়, না ভিয়েনা স্টেশনে পৌঁছে।

আজ চলেছি ভিয়েনা থেকে মিউনিখ। এবারও ট্রেনে, আর সেই একই ট্রেন। ট্রেনের নাম QBB railjet. কলকাতা থেকে এস এম এস-তাগাদা পেয়েছি— আজ এই ট্রেনেই আমার এই ভ্রমণ-এর নিত্য বকবকানি লিখে ফেলতে হবে। মিউনিখ পৌঁছেই যেন ফ্যাক্স করে দিই।

দুঃখের বিষয়, ছুটন্ত ট্রেনের বিরাট জানলা থেকে দেখা অস্ট্রিয়ার অপরূপ দৃশ্যমালা তো আর ফ্যাক্সে পাঠানো যাবে না!

এই পর্যন্ত লিখেই ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর তাগাদা এল ছবি পাঠানোর। এখন যেখানে যেমন আছি সেই ছবি-ই পাঠাতে হবে।

এখন আছি বহুদিনের বন্ধু ইসাবেলার বাড়ি। মিউনিখ থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরের হুহেনপ্রিসেনবার্গ গ্রামে।

এই ইসাবেলাই ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের টেনেরিফ দ্বীপ এ-মাথা থেকে ও-মাথা আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সেবার ওই দ্বীপে আটলান্টিকের কূলে ওঁরই বাসায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১০ অক্টোবর আমাকে হোটেল থেকে তুলে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালিয়ে ইসাবেলার বাড়িতে নিয়ে এল তার মেয়ে আর মেয়ের বন্ধু ক্রিস্টিনে আর প্রিকিতে। ওঁর বাড়িটা একেবারে প্রকৃতির মাঝখানে। সামনে সবুজ প্রান্তর, দু-চারটে ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, তারপরই সবুজে ঢাকা আল্পস।

ইসাবেলার মতে, আমার এখন অন্তরে-বাইরে গভীর নীরবতা দরকার। মনের ভেতর থেকে ফুলগুলি ফোটাবার জন্য। এই ল্যান্ডস্কেপ সেই নীরবতায় পৌঁছতে সাহায্য করবে।

সেদিনই রাতে ক্রিস্টিনে-প্রিকিতে আমাকে মিউনিখে আমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ৭৫ কিলোমিটার দূরে নিজেদের গ্রামের পথ ধরল।

এদিকে ইসাবেলার গ্রামে আমার যতদিন খুশি থাকার নেমন্তন্ন। কিন্তু এযাত্রা আমার বিদেশে থাকার মেয়াদ ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। প্লেনের টিকিটও সেইমতোই করা আছে, রসদও আছে সেই হিসেবে। পরদিন সকালেই ইসাবেলার ফোন পেলাম, গতকাল সবুজে ঢাকা যে অস্ট্রিয়ান আল্পস দেখে এসেছি, রাতেই তার মাথা সাদা হতে শুরু করেছে। দু-তিনদিনের মধ্যেই ইসাবেলার গ্রামে, বাড়ির বারান্দায় বরফ পড়া শুরু হয়ে যাবে। অতএব জয় মা সরস্বতী বলে হোটেলের পাট চুকিয়ে ১৪ তারিখ বেরিয়ে পড়াই ঠিক করলাম। প্লেনের টিকিট কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিলেই হবে।

সারাদিন সামনে ছড়ানো আল্পস পর্বতশৃঙ্গ। সারাদিন সারারাত ঝিরিঝিরি তুষারপাত হয়েই চলেছে। ঘরের ঠিক বাইরে থেকে পাহাড়ের পাদমূল পর্যন্ত ঘাসও সাদা। দেওয়াল জোড়া কাচের মধ্যে দিয়ে তুষারপাত দেখা একদিনেই আমার অভ্যাস হয়ে গেল। মাঝেমাঝেই চোখ তুলে দেখি। সেভাবেই প্রথম দিনই 'বরফের বাগান' লেখা শুরু হয়ে গেল। বাকি যে চারদিন ছিলাম, সারাক্ষণ বরফ পড়া দেখি আর যতটা পারি 'বরফের বাগান' লিখি।

'ভ্রমণ', নভেম্বর ২০০৯

বেদুইনদের তাঁবুতে

এই গ্রীষ্মে উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় মরুভূমির ঠিক মধ্যিখানে ইতিহাসের স্বর্ণখনি প্রাচীন পালমিরা শহরের ধ্বংসাবশেষে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাঁধে ভ্রমণ-এর স্থিরচিত্র আর ভ্রমণ-ভিডিওর চলচ্চিত্র তৈরির দায়, আর মনে দুর্বিষহ বিস্ময়ের আলোড়ন— হঠাৎ দূর থেকে উচ্চকণ্ঠে 'স্যার' 'স্যার' শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি অনেক দূরে বিশাল একটা তোরণের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমার গাইড আমাকেই ডাকছে। ছায়ায় ফিরে আসতে বলছে। ফেরা তখন অসম্ভব।

আরও এগিয়ে, বিরাট বিরাট পাথুরে দালান, দরজা, চত্বর, চূড়া কখনও পার হয়ে, কখনও বেয়ে উঠে ছবি তুলে গাইডের কাছে এসে শুনলাম পালমিরায় কেউ কখনও গ্রীষ্মকালে বেড়াতে আসে না। 'ওই যে দেখছেন বিখ্যাত পালমিরা চাম হোটেল, পুরোটাই এখন ফাঁকা। এখানে এখন টেম্পারেচার কত জানেন? ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস!' শুনেই বুঝলাম কেন এতক্ষণ একটু ছায়ার জন্যে ছটফট করছিলাম। আবার এও ঠিক, মরুভূমির 'কনে' এই পালমিরায় সে যুগে সিল্করুটের উটযাত্রীরা দুদিন জিরিয়ে নিত।

সিরিয়ায় আমার বরাদ্দ মাত্র পাঁচদিন। তার মধ্যে অত শীত-গ্রীষ্ম বাছলে আমার চলে! লেবাননের রাজধানী বেইরুট থেকে সোজা চলে এসেছি সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে। দেশটার পুরো নাম জানেন তো— 'সিরিয়ান আরব রিপাবলিক'। উঠেছি পুরনো দামাস্কাস শহরে।

দামাস্কাস থেকে ২১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে প্রাচীন পালমিরার ধ্বংসাবশেষে বেশ কয়েক ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে না ঘুরলেই নয়। সত্যি বলতে কী, ৬ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রুদ্ধশ্বাস এই ধ্বংসদৃশ্যে গোটা একটা দিন কাটাতে পারলে তবেই এর এখনও অবশিষ্ট স্থাপত্যের বিশালতা, বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য কিছুটা বোঝা যাবে। আর এই বিরাট ধ্বংসলীলার পরতে পরতে ধরা আছে পালমিরার মহিমময়ী রানি জেনোবিয়ার অসীম স্বপ্ন-কল্পনার সগৌরব কীর্তিকাহিনী।

১৯ জুন সকাল ন'টায় বেরিয়ে পালমিরা ঘুরে হোটেলে ফিরতে রাত ন'টা হয়ে গেল। পরদিন গেলাম দামাস্কাস থেকে ১৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বসরায়। শুনলাম খ্রিস্টপূর্ব ১৪ শতকেও অতি প্রাচীন এই শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে ১০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট ট্রাজান-এর আমলে 'প্রভিন্স অব আরাবিয়া'র রাজধানী করা হয় বসরাকে। ক্যারাভান রুটের একটা সংযোগস্থল হিসেবেও সে যুগে বসরার খুবই গুরুত্ব ছিল। সিরিয়া বিষয়ক একটা তথ্য-পুস্তিকায় দেখলাম, বসরার অধিবাসী বাহিরা নামে এক নেস্টোরীয় সাধুর সঙ্গে এখানেই তরুণ হজরত মহম্মদের দেখা হয়েছিল। যুবক হজরত তাঁর উটের সারি নিয়ে যাত্রাপথে এখানে বিরতি নিয়েছিলেন। তিনি যে নতুন ধর্মমত প্রচলন করবেন— সে বিষয়েও বাহিরা এখানেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

বসরায় পর্যটকদের বড় একটা আকর্ষণ দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে তৈরি বিরাট রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার। রাজা-রানি ও রাজপরিষদের বিশিষ্টদের বিশেষ আসন ছাড়াও ১৫,০০০ দর্শকের বসার ব্যবস্থা এখনও বেশিটাই অক্ষত দেখে আর চোখ ফেরানো

যায় না। পুরো মুক্তাঙ্গন থিয়েটারের ছবি নিতে গ্যালারির একেবারে ওপরের সারির মাথায় গিয়ে উঠতে হল। সেখান থেকে বাইরে শহরটার একটা চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল। বসরার বিখ্যাত এই রোমান থিয়েটারে আসার পথে একটু আগেই ঘুরে এলাম মালোলা গ্রামে। বহু প্রাচীন গ্রাম। এখানকার অধিবাসীরা এখনও আরামিক ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় যিশুখ্রিস্ট কথা বলতেন।

বড় ও বিখ্যাত কোনও গন্তব্যে যাবার পথে এভাবেই আমার নানা সময়ে নানান বিস্ময়কর প্রাপ্তি ঘটেছে। যেমন বসরা থেকে ফেরার পথে মরুভূমির মধ্যে দূরে বেদুইনদের তাঁবু দেখে গাড়ির রাস্তা ছেড়ে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছে যা পেলাম তা এক অপ্রত্যাশিত পাওয়া! কী পেলাম? তাঁবুর সামনে বেদুইনদের নাচ-গান। এক বেদুইন রমণী তো আমাকে হাত ধরে তাঁবুর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। 'হালওয়া' খাওয়াল।

এরকমই, লেবানন-সিরিয়া যাবার দিনকয়েক আগে ভূপাল থেকে পাঁচমারি যাবার পথে একটু ঘুরপথে গিয়েছিলাম তাওয়া নদীর কূলে— জলে-হাওয়ায় পাগল-করা সে এক অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক আতিথ্য। মনে হয় মধ্যপ্রদেশ পর্যটন দপ্তরের ওই আশ্চর্য নদীতীরাবাসের সামনের উদ্যানে সারারাত জেগে বসে বিশুদ্ধ নদীর হাওয়ায় মনপ্রাণ জুড়িয়ে নিই। অথবা রিসর্টে না থেকে নদীর বুকে দু-ঘরের চমৎকার হাউসবোটে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, সেই নৌকাগৃহে চড়েই সকাল-বিকেল নদীতে বেড়িয়ে ভ্রমণ সার্থক করি।

আমি তাওয়া গিয়েছিলাম পাঁচমারি যাবার পথে। যাঁরা এই লেখা পড়ে তাওয়া যাবার কথা ভাববেন তাঁরা সরাসরি ইতাচি জংশন স্টেশনে নেমে পড়তে পারেন। ইতাচি থেকে তাওয়া মাত্রই ৩০ কিলোমিটার।

'ভ্রমণ', জুলাই ২০১০

রিলা নদীর ধারে

একবার 'এক্সপ্রেসেন' নামে বিপুলপ্রচার একটা সান্ধ্য দৈনিকের শহর স্টকহোলমে গিয়ে শহর থেকে অদূরে ছোট্ট একটা দ্বীপে এক মাসের আতিথ্যের আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। গিয়েছিলাম এক সপ্তাহের কাজে, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ওই দৈনিক পত্রিকাটির অফিসে, সেখানে তাঁদের আগের কয়েক দশকের সংবাদ ও ফিচার পরিবেশনের ক্রমপরিবর্তন বা বিবর্তন বুঝতে।

আমার সেই প্রথম বিদেশযাত্রায় আমার ভাই কমলের সুইডেনপ্রবাসী এক বন্ধুর মুখে আমার বিষয়ে সত্যিমিথ্যে সাতকাহন শুনে এক সুইডিশ দম্পতি আমাকে নির্জনে বসে বই লেখবার সুবিধা করে দিতে স্টকহোলমের কাছেই তাঁদের ছোট্ট দ্বীপটি আমার জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোটা দ্বীপে একটিই বাড়ি, কাঠের তৈরি। ছোট ইঞ্জিনবোটে এক মাসের মতো ডিম, আলু, মাখন, চিজ, পাউরুটি এমনকি বাসমতী চাল বোঝাই করে দ্বীপমালিক স্বয়ং আমাকে সেখানে পৌঁছে

দেবেন। মাছ ধরার কয়েকরকম ছিপ তো দ্বীপের বাড়িতেই পাওয়া যাবে, সাগরজলে মাছেরও অভাব নেই, শুধু ধরবে আর খাবে। কিচেনে সব ব্যবস্থাই পাবে।

সবাই জানেন, এই ধরণের নিমন্ত্রণ সদাই ভাগ্যের দোষে ফসকে যায়। সেবার আমার সুইডেনের মেয়াদ ছিল ওই এক সপ্তাহই। পরের সপ্তাহে কোপেনহেগেনে 'পোলিটিকেন' সংবাদপত্রগোষ্ঠীর অফিসে তাঁদের দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের বিবর্তন বোঝবার চেষ্টা ছাড়াও চারদিনের বিশ্ব সংবাদপত্র সম্মেলনে হাজিরা দেওয়ার দায়ও ছিল।

সেই দুঃখের কথা আজও ভুলিনি। এবার তাই দ্বিগুণ উৎসাহে ভাবছি বুলগেরিয়ার রিলা-য় দিন কয়েকের স্বপ্নাবাসে কাটিয়ে আসা যায় না? সেখানে অঢেল সবুজে ঘেরা উচ্ছ্বসিত খরস্রোত পাহাড়িয়া নদীটির গা-ঘেঁষা ছোট্ট হোটেল। তার সামনেই ন'দিক খোলা আরও ছোট রেস্তোরাঁয় সারাদিন বসে থাকলেও মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। মনোরম দৃশ্য, নির্মল হাওয়া, প্রাকৃতিক জল মন ভরে, প্রাণ ভরে, তৃষ্ণা হরে যথেচ্ছ নিন, কোথাও কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। সঙ্গে দু'বেলা তাজা স্যালাড, কবোষ্ণ ব্রেড, ঘন মধু, গাঢ় দই, আর, নিরামিষাশী না হলে, নদীর টাটকা ট্রাউট, গ্রিল করা। নদীকূলের ওই মনোহরণ হোটেলে থাকার খরচ জানতে চান? দুই-শয্যার ঘর ৩০-৩৫ ইউরো। খাওয়ার খরচও পকেট-কাটা নয়, বরং অনেকটাই সাধারণের সাধ্যের মধ্যে।

রাজধানী সোফিয়া থেকে রিলা দুয়েক ঘণ্টার রাস্তা। তবে বুলগেরিয়ায় গিয়ে শুধু তো আর রিলা থেকেই ফিরে আসা যায় না। আবার রিলা মানেই শুধু ওই নদী-ছোঁয়া হোটেলবাস নয়। ওখান থেকেই দেখে আসা যায় কাছাকাছি রিলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দশম শতাব্দীর রিলা মনাস্ট্রি। রিলা পাহাড়ের সুগন্ধি সরলবর্গীয় বৃক্ষরাজির মাঝে সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় বুলগেরিয়ার ওই মধ্যযুগীয় স্থাপত্যবিস্ময়। মনাস্ট্রি দেখতে গ্রীষ্মের মরশুমে প্রায় রোজই পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। অনেকে আবার মনাস্ট্রির কাছেই অনতি-উচ্চ পাহাড়ের বুকে গাছপালায় ঘেরা হোটেলে দুয়েক রাত থেকে যান, সেখান থেকে চোখ মেললেই মনাস্ট্রি। সে-হোটেলের ভাড়াও দুজনের ৩০-৪০-৫০ ইউরোর মধ্যে।

ছ-সাতদিন বা আট-ন'দিন ধরে বুলগেরিয়া ঘুরে বেড়িয়ে ফেরার পথে, সোফিয়া পৌঁছবার ঠিক আগে, সামান্য বাড়তি খরচে রিলার ওই নদীর ধারের হোটেলে থেকে যান। সারাজীবন না পারলে, যে-ক'দিন সম্ভব।

মাত্র পাঁচ-ছ'দিনে একটা দূর-দেশের কতটুকুই বা দেখা যায়! তবে সেভাবে দেখলে, হয়তো দু'দিনেও অচিন দেশের আবহমানকালের মর্মকথা আপনার মন ছুঁয়ে যাবে। আমার যেমন, এই মে মাসের শেষে, প্রতিদিনই দেড়শো-দুশো মাইল দূরে দূরে সরকারি-বেসরকারি সেমিনার-প্রদর্শনী-প্রেজেন্টেশানের দৌড়োদৌড়ির মধ্যেও ছ-দিনের ঝটিকাসফরে বুলগেরিয়া ঘুরে মন ভরে গেছে।

দেশভ্রমণের সঙ্গে দেশ আবিষ্কারের আনন্দ মিশে গেলে ওমনিই হয়, ভ্রমণের রেশ সারাজীবন মনের মধ্যে থেকে যায়।

বহুল প্রচারিত, বহুজনের অভ্যস্ত পশ্চিম-ইউরোপ সফর আমাকে এখন আর

তেমন টানে না। তুলনায় পূর্ব-ইউরোপের প্রাচীন ঐতিহ্য আগলে রাখা ছোট ছোট সহৃদয় দেশগুলো আমার কাছে অনেক বেশি মায়াময় মনে হয়। যে-দেশ তার যত নিজস্বতা ধরে রাখতে পেরেছে, আচার-আচরণে, লোক-লৌকিকতায়, মনের ভাব-ভালোবাসায় প্রাচীন রীতি-নীতি আমূল মুছে ফেলেনি, সেই দেশ আর সে-দেশের মানুষের আলিঙ্গন আমি দূর থেকেও অনুভব করতে পারি।

বুলগেরিয়া সেইরকম একটি দেশ। আধুনিকতার দিকে সবরকম অদল-বদল সত্ত্বেও দেশটার চিরায়ত মন আজও অনেকটাই যেন তেমনই আছে। বুলগেরিয়ার মধ্যযুগের রাজাদের প্রিয় রাজধানী ভেলিকোতার্নোভো-র পথে ও পাহাড়ে তো এখনও প্রাচীনতার ঘ্রাণ লেগে আছে। আধুনিক রাজধানী শহর সোফিয়া ইউরোপের আর পাঁচটা শহরের মতো হয়েও তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভোলেনি দেখে ভালো লাগে।

যখন যে-দেশেই যাই, আমার সবসময় মনে হয় অন্তত গোটা একটা ঋতু সে-দেশে না থাকলে দেশটা আমার দেখাই হবে না। ঋতুপরিবর্তনের দিনগুলোতে যে-কোনও দেশের আকাশ-বাতাস, চারপাশের প্রকৃতি, মানুষের মন, মেলা-পার্বণ দেশটাকে আমার বুকের আরও কাছে এনে দেবে— এ আমার অনেকদিনের আশা। এ সেই আশা, সেই স্বপ্ন, যা না-ভাঙা পর্যন্তই সত্যি থাকে।

সোফিয়া, প্লভদিভ, ভেলিনগ্রাদ, ভেলিকোতার্নোভো— ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতি আর জনপদবাসী— এই চতুরঙ্গে ঘুরে দেখে সুখে বেড়াতে বেড়াতে আশপাশের আরও অনেক ঐশী সম্পদ দেখা-ছোঁয়া হয়ে যাবে। আমাদের পক্ষে আরও একটা আকর্ষণ— বুলগেরিয়া এখনও বেশ কিছুটা সস্তা-গণ্ডার দেশ। সাতদিনের এরকম একটা ভ্রমণের মাথাপিছু খরচ, তিনতারা হোটেলে রাত্রিবাস, ঘোরাঘুরি, থাকা-খাওয়া, গাইড, সব ধরে মোটামুটি ৫০০ ইউরো। পাঁচতারা হোটেলে থাকতে চাইলে ৬৫০-৮০০ ইউরো।

তবে এর ওপর আছে বিমানভাড়া, ভিসা ও বিমাখরচ আর হাতখরচ, সঙ্গে হয়তো এক-আধবারের স্পা-খরচ।

ছ-দিনের ছুটোছুটিতে যেটুকু দেখেছি, যা কিছু ছুঁয়েছি তাতে আমার তো মনে হয়, বুলগেরিয়ার রূপ-রঙের কথা পাঁচ মুখে বলবার মতো। ভেলিকোতার্নোভো থেকে গোলাপ-উপত্যকা কাজানলাক-এর দিকে যেতে গবরোভো শহরের প্রান্তে ছোট্ট গ্রাম এতেরা-য় চারুকলা-কারুকলার প্রাচীন ঐতিহ্য আজও যেভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তার কথা কিংবা বুলগেরিয়ার দুঃখহরা দই বা বহু স্বাদের মধুর কথা এক লহমায় বলি কী করে। ইয়োগার্ট বা দই নিয়ে বুলগেরিয়ার মানুষের গর্বের শেষ নেই, মানবসভ্যতায় বা খাদ্যসংস্কৃতিতে দই নাকি বুলগেরিয়ার-ই অবদান! দই জমানোর ব্যাক্টেরিয়া তাদেরই আবিষ্কার। কথায়ই তো আছে 'মাইক্রো ব্যাসিলাস বুলগারিস', শোনোনি তোমরা? রিলা মনাস্ট্রির অদূরে রিলা নামের পাহাড়ি নদীর গায়ে ছোট্ট হোটেলের লাগোয়া অপার আকাশের নীচে প্রায় স্রোতছোঁয়া সবুজ প্রান্তরে খাবার টেবিলে একথালা স্যালাড, একঝুড়ি বুলগেরিয়ান ব্রেড, নদীর আস্ত ট্রাউট আর বিরাট একবাটি দই আর মস্ত এক পাত্র গাঢ় মধু সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলকান

কন্যা সহাস্য প্রশ্ন করলেন।

মধুর কথায় মনে পড়ল, এই রকমই প্রায় জমাটবাঁধা মধু কাঠের মোটা খুন্তি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে জোর করে আমার না-ধোওয়া দু'হাত ভরে দিয়েছিলেন জর্জিয়ায় তুর্কিসীমান্ত-ঘেঁষা আখালসিখে গ্রামের বাজারে এক দৈত্যকায় দোকানদার।

'ভ্রমণ', জুন ২০১২

বিছুটি ফুলের স্যুপ

আকাশের মতো বিরাট ক্যানভাসে এ যেন সদ্য আঁকা ছবি। ভোরের ঘুমচোখেও চোখ ফেরাতে পারি না। ঝাপসা পাহাড়ের পিছনেই কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারমুকুট। লাল কমলা হলদে রঙে রাঙানো।

ঠান্ডার ভয় ভুলে বাইরে এসে ধীরে ধীরে বদলানো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলাম অনেকক্ষণ।

বাগডোগরা থেকে কালিম্পং লাভা ছাড়িয়ে বাঁদিকে মোড় নিলেই নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের শুরু। এরপর এখান থেকে কোলাখামের দিকে যত এগিয়েছি, ততই আদিম পৃথিবীর স্বাধীন জঙ্গলরাজ্যের ভিতরে ঢুকেছি। শেষ বিশ মাইল প্রায় বিষময়। গাড়ি প্রতিমুহূর্তেই ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে চাইছে।

শেষ পর্যন্ত নেওড়া ভ্যালি জাঙ্গল ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে সামনের বিপজ্জনক পাথুরে প্রবেশপথটুকু হেঁটে যেখানে থিতু হলাম সেখানে আসার জন্য এই পথযন্ত্রণা তুচ্ছ মনে হল।

পাহাড়িরাজ্যে পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন জঙ্গলে লুকনো এই অরণ্যাবাস। রাইগ্রামের রুক্ষ পাথুরে শিরোচত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের চাঁই জড়ো করে তৈরি এই জংলিনীড়ের ভিত। বনদপ্তরের কেটে নেওয়া গাছের ফেলে দেওয়া ছাল দিয়ে হয়েছে ঘরের দেওয়াল, ছাদের সিলিং। এই আরণ্যক স্থাপত্যের শ্রমিকরা সবাই স্থানীয় মানুষ, গাছ পাথর যাদের আজন্ম সঙ্গী।

জাঙ্গল ক্যাম্পের ম্যানেজার সুখেন্দু পাল এখানকার এই রাইগ্রামের মেয়ে ইন্দুকে বিয়ে করে রাইবাড়ির জামাই। এই পাহাড়ি জমিও রাইদেরই। ওঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রকৃতিরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী এই জংলি শিবির গড়েছে হেল্প ট্যুরিজম। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ অক্ষুণ্ণ রেখেও ঘরে স্নানঘরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা।

নেওড়া ভ্যালির মর্মলোকে আসার পথ দেখিয়েছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটনপুরোহিত রাজ বসু।

আমাদের পেয়ে মালিক-ম্যানেজারের যেন ভারি আনন্দ হয়েছে। তিনি নাকি জানতেন যে একদিন না একদিন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবেই। পনেরো-ষোল বছর ধরে এই দিনটার জন্যই নাকি অপেক্ষা করছিলেন। তার চেয়েও অবিশ্বাস্য, তিনি নাকি 'ভ্রমণ'-এ আমার সব লেখা পড়ে মনে রেখেছেন।

নেওড়া ভ্যালি জঙ্গল ক্যাম্পে ছিলাম মাত্র দু'টি রাত, কিন্তু সামান্য এই দু'দিনের

অসামান্য সব সকাল দুপুর সন্ধে রাত আমার মন জুড়ে ছিল।

এখানেই প্রথম জানলাম বিছুটি ফুলেরও স্যুপ হয়। গ্রামে যাদের শৈশব কেটেছে, তারা নিশ্চয়ই বিছুটি পাতার জ্বালা কী জানেন। সেই বিছুটি ফুলের স্যুপ নাকি হাই ব্লাড প্রেশারের চমৎকার ওষুধ। সুখেন্দুর কথায় আমরা তো দু'বেলাই এক বাটি করে খেলাম।

বিছুটি পাতাকে রাইগ্রামের মানুষ বলে শিষনু। নেপালি রাই পরিবারের জামাই আমার কৌতূহল মেটাতে সারাদিনে আমাদের অনেক গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উত্তিস, অবখোউলো, কাটুস, ভদ্রাসে, কাউলো, শিশি, লালী, পানিসাস, ধুপি, অখর— অদ্ভুত নামের সব গাছপালা, গুল্মলতা, বেশির ভাগ গাছই এই প্রথম দেখলাম। পুরো এলাকাটা এক মহারণ্য। জানা-অজানা পাখি-পতঙ্গের বংশানুক্রমিক বিচরণক্ষেত্র।

অনেক নীচে কোলাখাম রাই ভিলেজ, সেও মনে হয় কেউ এঁকে রেখেছে। সেখানে পাহাড়ের আকাশ-পাতালে ঘেরা, জঙ্গলের সঞ্জীবনী সুধা ভরা গ্রামে নদীর ধারে, ঝরনার কোলে গিয়ে থাকার জন্য আমার ব্যাকুলতা বুঝে সুখেন্দুর উৎসাহ আর ধরে না। কালই নিয়ে যেতে চান। নদীর ধারে, ঝরনার কোলেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই গ্রামে যদি যেতে পারতাম, থাকতে পারতাম বেশ কিছুদিন, দূরে দূরে ছড়ানো ঘরের মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করে কাটত সারা বেলা, তাহলে আমি নিশ্চিত জানি ওইখানেই পেয়ে যেতাম না-লেখা এক ভ্রমণকাহিনি।

'ভ্রমণ', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩

ভ্রমণের নতুন দিক, নতুন দ্যুতি

ভ্রমণের সব ক'টি দ্যুতি কি দেখা হয়েছে আমাদের? ছোঁয়া হয়েছে সব ক'টি মাত্রা? মনে হয়, না। ভ্রমণার্থীভেদে ভ্রমণের কাছে প্রত্যাশা বা প্রার্থনাও ভিন্ন। কেদার-বদ্রী কি অমরনাথে তীর্থযাত্রা যেমন আছে, তেমনই আছে দুর্গম পার্বত্যনিসর্গের হাতছানি। বা কারও মনে যদি দু'টিই থাকে, তার নিশ্চয়ই একটি কম, আরেকটি বেশি। পুরী বা বারাণসী ভ্রমণ যেমন অনেকের কাছে অনেকটাই ধর্মদীক্ষিত, অনেকের কাছে আবার সুমদ্রতরঙ্গতাড়িত দুয়েকটি সৈকতদিবস বা কাশীতে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা গঙ্গাবিহার।

এমনও দেখেছি, একই অঞ্চল ঋতুপরিবর্তনে রূপ রং এমনকী গন্ধ বদলিয়ে নতুন হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে সেই ভ্রমণও তো তখন ভ্রমণেরই আরও একটি মাত্রা।

ভ্রমণের এরকম আরও অনেক মাত্রা, প্রবণতা, স্বরূপ।

দেশের বাড়ির খোঁজ তেমনই এই বঙ্গে পর্যটনের এক নতুন মাত্রা। গত কয়েক দশক দেখছি, দেশে দেশে দেশভাগের পর দুই অংশের মানুষ, কোথাও কোথাও, তার স্বজন থেকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় কাতর। বিশেষ করে যেসব দেশে একই দেশের ভাঙা দুই ভাগের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় কাঁটাতারের বেড়া।

ভারতভাগের যন্ত্রণা, বঙ্গভঙ্গে সব হারানোর হাহাকার এখনও অনেকের স্মৃতিতে খোদাই করা আছে।

পরে রাজনৈতিক বদলে, পারস্পরিক বোঝাপড়ায় ভাঙা দুই দেশের মধ্যে আগের মতোই যাতায়াত সহজ হলে, ফেলে আসা বাড়ি-জমি স্বজন-বন্ধুর দেখা পেতে মন তো চাইবেই। অনেকের কাছে সে এক সঞ্জীবক স্মৃতিযাত্রা।

সেই ভাঙা বঙ্গের মাতৃভাষা-অন্তপ্রাণ স্বাধীন বাংলাদেশে আমার স্বজন স্বগৃহ কিছু নেই, ভারত ভাগের অনেক আগেই পূর্ববঙ্গের পাট উঠিয়ে আমার বাবা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে ও তার পরে বারুইপুরে থিতু হয়েছিলেন। আমার জন্মও দেশভাগের আগে, শ্রীরামপুরে।

পূর্ববঙ্গে আমার প্রথম ভ্রমণ পূর্ববঙ্গ স্বাধীন বাংলাদেশ হবার তিন দশক পরে, সরকারি নিমন্ত্রণে। সেও শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কক্সবাজার।

সেকালের পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির কোনও স্মৃতি বা তার সন্ধান আমার কখনও মনে আসেনি, দেশভাগের বেশ কয়েক বছর আগে আমার স্বল্পবাক বাবা সেই যে তাঁর জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চলে এসেছিলেন, তাঁর কাছেও বিশেষ কিছু শুনিনি। শুধু শুনেছিলাম বরিশালের খলিসাকোটার কোথাও ছিল আমাদের পৈতৃক বাড়ি। বড় হয়ে শুনেছি, কী এক দুর্জ্ঞেয় কারণে মনের দুঃখে রাগে নিজের এসরাজ ও গাঁদা-জবা-হলুদবাটা রঙে আঁকা ছবির বোঝা কীর্তনখোলা নদীতে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর বড় সাধের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন। অনেক পরে, দূরদর্শনের গোড়ার যুগে ক্বচিত-কখনও টিভিতে বাংলাদেশের মাঠঘাট নদী খেত দেখা গেলেই সেই সব ঝাপসা দৃশ্যের ওপর ঝুঁকে পড়তেন। তারপর বুকে হাত বোলাতে বোলাতে ঘরময় পায়চারি করতেন।

আমার জীবনে প্রথম বরিশাল দেখার সুযোগ ঘটল এই ২০১৮য়। রূপসী বাংলাদেশের দুয়েকটি রূপ নিয়ে একটা ভ্রমণচিত্র তৈরির কাজে এবছর সে-দেশে বারকতক ঘুরলাম। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় 'ইলিশের বাড়ি' বলে খ্যাত চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে সকাল সন্ধে নৌকোয় ভেসে ইলিশ ধরার ছবি তোলার পর গিয়েছিলাম কক্সবাজার। একবেলায় ঘুরে এলাম টেকনাফ অবধি। এই অক্টোবরেই যেতে হয়েছিল ঢাকা বরিশালের দুর্গা পূজার ছবির টানে। সপ্তমী অষ্টমী ঢাকায় পুজোর ভিড়ে কোনওক্রমে ক্যামেরা চালিয়ে সেদিনই বরিশাল যাবার রাতের স্টিমারে চড়ে বসলাম। শুনলাম, ঢাকা-বরিশালের এটাই নাকি সর্বাধুনিক স্টিমার। শুধু রাতেই যাতায়াত করে। স্টিমারের নাম সুন্দরবন-১১। নামে যেমন আপনপরশ, ভি আই পি কেবিনের সাজসজ্জায় আপ্যায়নেও তেমনই। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত কেবিনের বাইরে কেবিন সংলগ্ন নদীমুখী চিলতে বারান্দায় সতৃষ্ণ নয়নে নদী দেখে রাত কাটল।

রাতের স্টিমার বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা পাড়ি দিয়ে কীর্তনখোলা নদীর কূলে ভোররাতে পৌঁছল পূর্বপুরুষের বরিশালে। যেখানে জন্মাইনি, আসিওনি কখনও, শুধু দুয়েকবার বাবার মুখে শোনা সেই বরিশালে।

নেমেছি বরিশাল নদীঘাটে, শহরে। অভিজাত হোটেলের স্যুইটের ব্যালকনি থেকে দেখা যায় বিরাট বঙ্গবন্ধু উদ্যান, ঢাকার রমনা উদ্যানের মতো এখানেও

প্রাতঃভ্রমণকারীদের সমাবেশ। শহরের প্রধান রাস্তার ধারে গাছপালায় প্রাণবান বিরাট বিরাট জায়গা জোড়া স্কুল-কলেজ। দানমহর্ষি অশ্বিনীকুমার দত্তের জমিতে, তাঁরই নির্মাণ। শহরের মধ্যে চারদিক বাঁধানো 'বিবির পুকুর', চারণকবি মুকুন্দ দাসের প্রতিষ্ঠা করা কালীমন্দির দেখতে দেখতে বেলা শেষ হয়। বিকেলে দুই বাংলার রবীন্দ্রোত্তর মহাকবি জীবনানন্দ দাসের বাড়ির ধূসর পাণ্ডুলিপিই শুধু দেখা হল। সন্ধের মুখে দেখতে গেলাম শব্দাবলী স্টুডিও থিয়েটারে নতুন নাটকের মহড়া।

পরদিন সকালে গাড়িতে গেলাম ঝালোকাঠি, খলিসাকোটা। পথে হাটবাজার মন্দির মসজিদ, আর গাছপালা বনজঙ্গল পুকুর দিঘিতে সবুজ সজল গ্রাম। ছোট ছোট ঘর সংসার। অধিকাংশই কৃষিজীবী। অন্তরের উষ্ণতা মাখা তাদের কথালাপ। মন টেনে ধরে।

খাঁটি গ্রামের জন্য আজকাল আমার মন কাঁদে, খলিসাকোটায় এসে কিছুটা যেন প্রাণ জুড়োল। তবে দূর অজ পাড়াগাঁয়েও যুগের নিয়মে আজকাল ভোটের রাজনীতির সচিত্র পোস্টার।

পরদিন পাঁচ নদী বেয়ে দেখে এলাম নদীপাড়ের গ্রামগুলি। এমন নিত্য জলে-ধোওয়া গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম দেখতে দেখতে মনে হয় এই গ্রাম এই নদী এ যেন গত জন্মের দেখা।

নদীই যে বাংলাদেশের জননী, এভাবে না ঘুরলে সে দৃশ্যই আমার দেখা হত না। বরিশাল তো নদীক্রোড়েই লালিত-পালিত। খালবিলে বোনা খলিসাকোটা তখন বাংলার ভেনিস।

শুনলাম, যখন সব মাঠঘাট খালবিল নদী শাখানদী উপনদী জলে ডুবে যায়, সেই বর্ষাকালে বরিশাল নাকি সব চেয়ে সুন্দর। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, এক ঘর থেকে আরেক ঘর, ঘরে যাইতে পথ যখন অফুরান, তখন নৌকো, শালতি, ডিঙি ছাড়া গতি নেই। সেকালের সেই পুববাংলার রূপ দেখেছি দুই বাংলার গল্পে উপন্যাসে। এক বর্ষায় সেকালের সেই জলের দেশ বরিশাল নিজের চোখে দেখব বলে বসে আছি।

এও কি ভ্রমণের এক নতুন দ্যুতি নয়?

'ভ্রমণ', ডিসেম্বর ২০১৮

গন্তব্যের সন্ধানে

পুজোর ছুটিতে যত জন যান কাশ্মীর বা কন্যাকুমারী, হিমাচল প্রদেশ, কি আমাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গ— পর্যটকের সংখ্যা সে তুলনায় অরুণাচল প্রদেশে অনেক কম। মণিপুর বা নাগাল্যান্ডে তো আঙুলে গোনা কয়েকজন। আমি অরুণাচল প্রদেশ গিয়েছিলাম চব্বিশ বছর আগে। নাগাল্যান্ডে গেছি বোধহয় তারও আগে। তখন ওই দুই রহস্যময় রাজ্যে বাঙালি পরিবার বা একক পর্যটক প্রায় দেখিইনি। কোহিমায় সেসময় সন্ধে হলে হোটেলের বাইরে বেরবার উপায় ছিল না। অনুমতি তো ছিলই না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গোলা বারুদের শব্দে কোহিমার বাতাসও কেঁপে উঠত।

দিনের বেলা কোহিমা ও তার আশপাশ স্বভাবসুন্দর, তৃষাতুর দু'নয়নে দেখে বেড়াতাম। নাগাদের রান্নাঘরে নাগা বউয়ের সঙ্গে কথালাপে কাটিয়েছি কতক্ষণ। আমাদেরই কপাল-বরাবর কুকুরের নাড়িভুঁড়ি শুকোবার জন্য মেলে দেওয়া আর পায়ের সামনে কাঠের উনুনে কুকুর বা আর কোনও প্রাণীর মাংস ঝলসানোর উৎকট গন্ধ। একদিন তো পথেই একটা বাড়ির সামনে তোরণ সাজিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে দেখে দাঁড়িয়েছি, এক বলশালী নাগা পুরুষ জোর করে ভেতরে নিয়ে বর-কনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সেদিন বিয়ের ভুরিভোজ না করে চলে আসার উপায় ছিল না। অগত্যা বেছে বেছে দুয়েকটা পদ চাখতেই হল। মণিপুর বা নাগাল্যান্ডেও কি আজকাল পর্যটকের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো বাড়ছে? এক ত্রিপুরাই এখন অনেকটাই গন্তব্যমুখর। গত শতকের শেষ দিকে পর্যটনক্ষেত্রে অবহেলিত এই রাজ্যটি নিয়ে 'ভ্রমণ'-এর বিশেষ প্রচ্ছদ কাহিনির পর ভারতের পর্যটন মানচিত্রে ত্রিপুরা সগৌরব স্থান পেয়েছে। কথাটা আমার নয়, ত্রিপুরার তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রীর আনন্দাশ্রু প্লাবিত দীর্ঘ টেলিফোন উক্তি। উত্তর-পূর্ব ভারতে কোনও কোনও রাজ্য আজও হয়তো বহুজনের আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

ছত্তিশগড়েও কি খুব বেশি মানুষ যাচ্ছে আজকাল? বেড়াবার পরিকল্পনা করার সময় সাধারণত বহুকথিত বিখ্যাত পর্যটনগুলিই আমাদের মনে আসে। সেটা দোষের বা ভুলের তো নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। তবু মনে হয় কোনও কোনও তত কথিত নয়, এমন জায়গাও মনের সামনে এলে মন্দ কী!

বিদেশ ভ্রমণেও এই চিরচেনা, অতিকথিত, বিশিষ্ট জায়গাগুলিতে পর্যটনের ঢল নামে। সবাই প্রধানত ঘুরতে যান পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ। এমনকী পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ, যেমন— হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, অস্ট্রিয়া, চেক, স্লোভাকিয়া ইত্যাদি এই স্তম্ভে দু'দশকের লেখালেখির ফলে আজকাল কোনও কোনও পর্যটনসংস্থা এর কোনও কোনও দেশ তাদের ভ্রমণসূচিতে যোগ করেছেন। সে তুলনায় মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজাকিস্তান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান ক'জন-বা জানি বা সেখানে যাই আমরা?

ইউরোপের মতো একেবারেই নয় এসব দেশ। ইরানে কিছু ধর্মীয় কড়াকড়ি লাগু থাকলেও, এসব ইসলামিক দেশে তার কোনও চিহ্ন নেই বললেই তো হয়। লেবাননে দেখেছি, রাস্তার ধারে কিছুটা উঁচু ও বিশাল জমিতে মুক্তাঞ্চল রেস্তোরাঁর পরিচারিকা হুঁকোসেবীদের টেবিলে হুঁকো দিয়ে যাচ্ছিল, তার পরনে জিনসের ট্রাউজার, গায়ে হাতকাটা জামা, মাথায় শুধু হিজাব, চুল যাতে বেরিয়ে না থাকে। খাবারও পরিবেশন করছেন ইনিই।

আজারবাইজানে তো মহিলারা হিজাবও ছাড়া। রাজধানী বাকুতে দেখলাম, ইউরোপের আধুনিকাদের মতো মেয়েদের একেবারে মডার্ন বেশভূষা। মধ্যরাতেও রেস্তোরাঁয় মহিলা ও শিশু সন্তান নিয়ে জমাটি সাড়ম্বর ডিনার সারছেন আজারবাইজানের মানুষ। প্রেমিক-প্রেমিকা বা একসঙ্গে এক বা একাধিক বান্ধবী-সহ মেয়েরাও ডিনারে মশগুল। মেয়েদের অনেকের মুখেই হুঁকোর নল। দিব্যি ধোঁয়া ছাড়ছেন।

বাকুর দুটো ফাইভ স্টার হোটেলে একদিন করে দু'দিন থেকে, উঠেছি এসে পুরনো বাকুতে আট-দশ ঘরের ছোট একটা হোটেলে।

মাড ভলকানোর টিলা পাহাড়ের যেসব মুখ দিয়ে থেকে থেকেই কাদা উদ্গিরণ হচ্ছে, সেই মুখের ছবি তুলতে ঝুরো পাহাড়ের বেশ একটু উঁচুতে দুই পা অসম্ভব জেনেও গেঁথে রেখে দাঁড়িয়েছি। সামনেই ক্যাস্পিয়ান সি, প্রবল হাওয়ায় মাঝে মাঝেই আপাদমস্তক টলিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ ছবি নেবার মধ্যেই ভারী ক্যামেরাসুদ্ধু পপাত ধরণীতলে।

দেখি কনুই থেকে ছ'-ইঞ্চি ছড়ে শিশিরবিন্দুর মতো রক্তবিন্দু ফুটে আছে, দূরে গাড়িতে ফিরে বাঁ পায়ের প্যান্ট তুলে দেখি হাঁটুর নীচেই কাছাকাছি দুটো লাল দ্বীপ, যেন উষার আলোয় টলটল করছে।

হোটেলে ফিরতেই রিসেপশনের তরুণটি, ইনিই আমার সুটকেস-টুটকেশ গতকাল ঘরে বয়ে দিয়ে গেছেন, ঘরে ঢুকে হাত ও হাঁটুর যথাক্রমে শিশিরবিন্দু ও একজোড়া লাল দ্বীপ শিশি প্রায় উপুড় করে ধুয়ে দিয়েছিলেন।

এদের আতিথেয়তার এখানেই শেষ নয়। সারাদিন ছবি তোলার শেষে সেগুলোর নোট লিখতে লিখতে দেওয়ালের ঘড়িতে রাত বারোটা দেখে খাদ্যের সন্ধানে পুরনো বাকুর দৃশ্য-গন্ধের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে জানা গেল যে, বাকুর সব হোটেল-রেস্তোরাঁয় রাত এগারোটায় কিচেন বন্ধ হয়ে যায়।

রাস্তার ধারেই একটা বন্ধ রেস্তোরাঁর সামনে বড় টেবিলের সামনে চেয়ার ও বেঞ্চি জুড়ে বসে আছে এক মাঝবয়েসি ভদ্রলোক। তার সঙ্গে তারই সমবয়সি এক মহিলা, এক তরুণী, এক কিশোরী। সবাই মিলে গল্পে মশগুল। কেউ বিয়ার, কেউ চা নিয়ে আড্ডায় মেতেছেন। এঁদের কাল রাতেও দেখেছি। এখানেই তরুণীটি আমাকে 'হাই' বলতে আমি থেমে গেলাম।

'কালও তোমাকে দেখেছি না? রাতের ফ্লেম টাওয়ার্সের ছবি তুলছিলে! হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন আস?'

মধ্যরাতে আমার খাদ্যসন্ধানের কথা শুনে ভদ্রলোক ও বোধহয় তাঁর স্ত্রী দু'জনেই আমাকে ডেকে বসালেন।

কিচেন বন্ধ হয়ে গেছে, তাই বলে বাকুতে ভারতীয় অতিথি কি উপোস থাকবেন!

ভদ্রলোক তক্ষুনি হাঁটতে হাঁটতে কাছেই ভার্জিন টাওয়ার্স অব্দি গিয়ে ফিরে এসে বললেন,'আসুন তো, আমার এক বন্ধুর রেস্তোরাঁ আছে। ওকেই ফোন করে দেখি। স্ন্যাকস-ট্যাক্স কিছু পাওয়া যায় কিনা।' বলে পুরনো আড্ডাস্থলে ফিরে এসে আমাকে বসালেন। তরুণী সরে বসে আমাকে বসাল। বসতেই আমাকে বড় একটা বিস্কুটের প্যাকেট থেকে পেপার ন্যাপকিনে গোটা চারেক বিস্কুট দিয়ে আমার সামনে তুলে ধরে বলল, 'কিছু তো খান।'

খিদেয় দুটো মোটা মোটা বিস্কুট খাওয়ার মধ্যেই পরিবারের কর্তা মিহি সুগন্ধি চিনি দেওয়া আট-দশটা ওয়েফার ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?'

'ভারত থেকে।'

পুরো পরিবারটা সঙ্গে সঙ্গে আমার ছবি তুলতে লাগল। সেই তরুণী তো আমার

সঙ্গে একটা সেলফিই তুলে ফেলল।

'আপনারা কি কাছেই কোথাও থাকেন?'

রাস্তার উলটো দিকে একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, 'বাড়িটার দোতলায় আমি আমার স্ত্রী কন্যা নিয়ে থাকি। ওই দু'জন আমাদের বন্ধু। বাড়ির একতলায় আমাদের ক্যাভিয়ারের রপ্তানি দোকান। সবই রাশিয়ার ক্যাভিয়ায়। ওখান থেকে এনে সারা ইউরোপে রপ্তানি করি।'

আজারবাইজানে শুনলাম কোনও ক্রাইম নেই। একা একা মধ্যরাতে পুরনো বাকুর অলি-গলিতে ঘুরে দেখলামও তা-ই। রাস্তায় রেস্তোরাঁয় ক্যাস্পিয়ান সাগর সৈকতে শুধু সদালাপী মানুষজন, সপরিবার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোনও বিপদ বিঘ্নের শংকামাত্র নেই। বহুবিবাহ সাধারণত নেই বললেই হয়। তিন তালাক তো কেউ জানে বলেই মনে হল না।

এইসব আশ্চর্য দেশে আমরা যাই না কেন? যেমন, মর্ত্যলোকে একটুকরো প্রকৃতই প্রাকৃতিক স্বর্গলোক কিরঘিজস্তান? বুখারা-সমরখন্দ সমৃদ্ধ উজবেকিস্তান? মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ দেশে অনলাইন ভিসা পাওয়া যায়। অন্তত দিন-দুয়েকের জন্য রাজধানী শহরে তিন-চার তারা ভালো কোনও হোটেলে অনলাইন কনফার্মড রুম রিজার্ভেশন করিয়ে তবেই অনলাইন ভিসার আবেদন করা যেতে পারে। অবশ্য কনফার্মড রিটার্ন এয়ার টিকিটও থাকা চাই। যে-কোনও ট্রাভেল এজেন্সির সাহায্যও নিতে পারেন। আসল কথা তো ওই আশ্চর্য অদেখা পৃথিবীর জন্য নিজেরই বুকের মধ্যে এক অনন্ত বিরহবোধ!

'ভ্রমণ', অগস্ট ২০১৯